মধ্যরাতের সূর্যের দেশে

জ্যোতির্ময় দাশ

বাংলা কবিতা

আসরে কবিতা পড়তে এতকাল পাড়ার বাইরে উখরা কিংবা হলদিয়া গিয়েছি; এবার যেতে হল তেপান্তর পেরিয়ে নরওয়ের রাজধানী শহরে -- ভূগোলে যার দ্বিতীয় নাম মধ্যরাতের সূর্যের দেশ। থাকি সরকারি দাক্ষিণ্য থেকে বঞ্চিত ও অবহেলিত হাওড়া শহরের কানা এবং ভাঙা এক গলির তস্য গলি কাঁটাপুকুর থার্ড বাই লেনে। কানা এই কারণে যে এই গলিটার উত্তরণ কোন সদর রাস্তায় হয়নি -- মাঝখানে মাঠের মধ্যে এসে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছে আমাদের বড়ো রাস্তায় পৌঁছতে হলে মাঠের ধুলো কাদা ভাঙতে হয় তিনশো পয়ষট্টি দিন। আর ভাঙা এই কারণে যে আমার তিন কুড়ি পাঁচের জীবদ্দশায় তাতে কোনদিন আলকাতরার প্রলেপ পড়তে দেখিনি।উটের পিঠের মতো রাস্তার গড়ন এখন।
সেই গলি থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে স্কান্ডেনেভিয়ান দেশের যে শহরে একদিন এসে পৌঁছেছিলাম সে শহরে কোন গলি নেই, সবই প্রশস্ত রাজপথ। সেই সব রাজপথে ধুলো অথবা কাদা নেই। তিন মিটার অন্তর অন্তর উন্মুক্ত আবর্জনায় উপচে পড়া ডাস্টবিন নেই। পথের ধারে খোলা নর্মদা অথবা ঢাকনা চুরি হয়ে যাওয়া হাইড্রেনের মৃত্যুফাঁদ পথচারীদের নির্লজ্জ ভেংচি কাটে না। এখানে প্রতিটি পথের দুপাশে চওড়া সিমেন্ট বাঁধানো - ফুটপাথ আছে, তার ওপর দিয়ে লোকজনেরা হাত - পা ছড়িয়ে হাঁটে। ফুটপাথে কোন হকার নেই বলে দৈনিক 'তোলা' বা মাসিক 'হপ্তা' আদায় করার জন্য কোন পুলিশের বড়বাবু নেই, রাজনৈতিক দাদা নেই, পাড়ার মাস্তান নেই।
আমাদের আটদিনের নরওয়েবাসের প্রতিদিন আমরা বারো থেকে চোদ্দ ঘন্টা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছি, কিন্তু কোনদিন কোনো দুর্ঘটনা বা অপরাধ ঘটলে অথবা ব্যক্তিগত বিপদে আপনি টেলিফোনে ১৪৪ ডায়াল করলে তিন মিনিটও পেরোয় না, আড়াই মিনিট সতেরো সেকেণ্ডের মাথায় অকুস্থলে তাদের সগৌরব আবির্ভাব ঘটে। তাদের ব্যক্তিত্বের দিকে তাকালে মন ভালো হয়ে যায় -- ভক্তি শ্রদ্ধা জাগে, আমাদেরর দেশের 'সেন্টার ফরোয়ার্ড' আর দক্ষিণ হস্ত প্রসারণী কাণ্ডালবাহিনী নয়। নরওয়ের রাস্তায় আরও কিছু জিনিসের অভাব আমার মধ্যবিত্ত বাঙালি চোখকে বিস্মিত করেছিল -- সে দেশের রাস্তায় বেওয়ারিশ কুকুর বেড়াল কিংবা শিবের প্রিয় নন্দী আর মা পোস্টার আর দেওয়াল লিখনের কুৎসিত প্রদর্শনী নেই। তার বদলে আছে নয়নশোভন দোকানের দৃষ্টিনন্দন শোকেশ সব। ঘ্রাণে অর্ধ ভোজনের মতো এইসব দোকানের শোকেশগুলো দেখতে দেখতে হাঁটলেই আনন্দে মন ভরে যায়।

একটু আগে ভূগোলের কথা ছিল, এবার পেছিয়ে এসে ইতিহাসের ব্যাপারটা ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে। আমরা ৩রা জুন ২০০৪ মধ্যরাতে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে রওনা দিয়েছিলাম চারজন ছাপোষা বাঙালি কবি -- আশিস সান্যাল, অপূর্ব দত্ত, দেবাঞ্জন চক্রবর্তী আর আমি। আমাদের নরওয়ের আসলো শহরে কবিতা পাঠের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করেছিল ইন্টারন্যাশানল সেন্টার ফর কালচার লিটারেচার অ্যাণ্ড পাবলিকেশন। সেই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নরওয়েবাসী বাঙালি কবি শ্রীনির্মল ব্রহ্মচারী। শ্রী ব্রহ্মচারীর ১৯৭৪ সালে

ইউরোপের এই উত্তরপ্রান্তিক রাষ্ট্র, যেখানে ছ'মাস দিন আর ছ'মাস রাত থাকে সেখানে এসে উপস্থিত হবার পেছনে জটিল কারণ ছিল। তিনি ষাটের প্রেসিডেন্সি, আলিপুর আর বহরমপুরের জেলখানাগুলো তাঁর পৈত্রিক ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মাথায় নক্সাল রাজনীতির চিন্তা থাকলে কী হবে, ধমনীতে তো বাঙালি রক্তের প্রবাহ --- তাই জাতিগতভাবে দ্বিতীয় চারিত্রিক দোষটাও পুরোমাত্রায় ছিল। তিনি জেলে বসে বসেও কবিতা লিখতেন। বছর চার - পাঁচ জেলখানার আধপোড়া টি আর পচা সব্জির ঘ্যাঁট খেতে খেতে তিতিবিরক্ত হয়ে শেষবার জেলের বাইরে এসে কলেজের অসমাপ্ত লেখাপড়াটা শেষ করায় মন দিয়েছিলেন। মাসতিনেকের অধ্যবসায়ে বিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে দাদা জীবনকৃষ্ণ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সিল্ক স্ক্রিনের পেন্টিং - এর ব্যবসা শু করেন। কিন্তু পুলিশ এই সহজ সত্যটাকে সরলভাবে মেনে নিতে পারল না। তারা ভাবল ছবি আঁকার কাজের আড়ালে নক্সালী ব্রহ্মচারী নিশ্চয় বোমা তৈরি করেছেন লুকিয়ে লুকিয়ে। অতএব পশ্চিমবঙ্গে আনাচে কানাচে কোথাও কোন আন্দোলনের কিছুমাত্র ঘটনার সূত্রপাত ঘটলে 'বেঁড়ে বেটাকে ধর' নীতিতে তাঁকে লকআপে তোলা হতে থাকায় তিনি শেষ - মেশ নরওয়েতে পালিয়ে এসেছিলেন।

নরওয়েতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের স্নাতক চাকরি পেলেন একটা মোটর গ্যারেজ ময়লা গাড়ি ধুয়েমুছে পরিষ্কার করবার -- অর্থাৎ এদেশের খালাসির কাজ। কিন্তু সন্ধ্যের পর পোড়া মোবিল তেল হাত থেকে ধুয়ে মুছে বাড়িতে ফিরে নিজস্ব সময়ে লিখতেন কবিতা - গান - ছড়া। পড়ে কাজের রকমফের হয়েছে। একটা বড়ো হোটেলের হিসাবরক্ষক হয়েছেন, আধাসরকারি পরিবহনের দপ্তরে কাজ করছেন দায়িত্বপূর্ণ পদে। শেষে একান্ন বছর বয়সে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে পুরোপুরি সাহিত্য সাধনার মধ্যে ডুব দিয়েছেন। বাংলা ইংরেজি ও নরওয়েজিয়ান তিন ভাষাতেই অনেকগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যপ্রেমের ভূতকে ঘাড় থেকে নামাতে না পেরে প্রতিবছর বইমেলার সময়ে কলকাতায় (অ্যারেস্ট হবার ভয়ে ১৯৮৪ সালে নরওয়ের নাগরিকত্ব অর্জন করার পর ভারতের মাটিতে ফেরৎ পা রেখেছিলেন) এসে মেলার ধুলো মাখেন এবং দেশের কবি সাহিত্যিকদেরর নেমন্তন্ন করে নরওয়েতে ডেকে নিয়ে যান মজলিশি সাহিত্যের আসর বসাতে। আমাদেরও সেই সুবাদেই আসা এই মধ্যরাতের সূর্যের দেশে।

মস্কোয় বিমান বদল করে একটু ছোটো বিমানে অসলোর গার্ডেমুয়েন বিমান বন্দরে এসে যখন পৌঁছলাম তখন সে দেশে দশটা, যদিও আমাদের ভারতীয় হাতঘড়িতে সে সময়ে প্রায় দুপুর আড়াইটে। এয়ারপোর্টে নির্মলদা (গত বইমেলাতে নিবিড় আলাপে আপনজন হয়ে গিয়েছিলেন) হাসিমুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এখনকার এই অমায়িক সুভদ্র মিতভাষী মানুষটি যে এককালে সাংঘাতিক খুনোখুনিররাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, দেখলে কে বলবে! মালপত্র নিয়ে নির্মলদার সঙ্গে বাইরে এসে দেখি নির্মলদার স্ত্রী কল্পনাবৌদি একটি ঝকঝকে নতুন এয়ারকণ্ডিসন্ড গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। বেশ বড়সড় গাড়ি। একটু এগিয়ে পিছিয়ে বসলে নির্মলদাও অনায়াসে গাড়িতে বসতে পারতেন কিন্তু ইউরোপে সাধারণ আকারের মোটর গাড়ি বা ট্যাক্সিতে ড্রাইভারসহ পাঁচজনের বেশি অনুমতি থাকে না বসবার।আর এই নিয়ম কেউই ভঙ্গ করেন না। ট্যাক্সির ক্ষেত্রে বেশি পয়সার প্রলোভনেও নয়। সুন্দরী কল্পনা বৌদি অসাধারণ ভালো গাড়ি ড্রাইভ করেন। তিনি পারিবারিক জীবনে দুই কন্যার স্নেহময়ী জননী, স্কুল - শিক্ষিকা এবং বিদেশে বাড়িতে রাজা, মন্ত্রী আর জমিদারর শ্রেণীর মানষজন ছাড়া অন্য কারো পক্ষে ঝি-চাকর রাখা সম্ভব নয় বলে কল্পনাবৌদি এক কর্মঠ গৃহকর্ত্রীও বটেন। আমরা সেই যে এয়ারপোর্টে কল্পনাবৌদির গাড়িতে চেপে বসেছিলাম তার থেকে বিশেষ একটা আর অবতরণ করিনি। তিনি আমাদের নরওয়ের যাবতীয় দ্রষ্টব্য ও গন্তব্যের সারথি এবং গাইড ছিলেন।

এয়ারপোর্ট থেকে নির্মলদার বাড়ি প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারের মতো রাস্তা। নির্মলদা মেট্রো ট্রেনে এলেন বিশ ক্রোনারের টিকিট কেটে, ভারতীয় টাকায় প্রায় একশ চল্লিশটাকা ব্যয় করে। গাড়িতে উঠতে উঠতে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। অসলোর বাতাসে এমনিতেই ধুলোময়লা নেই কিন্তু বৃষ্টির পর তা যেন আরও নির্মল ও শুদ্ধ হয়ে উঠল। পাহাড়ি রাস্তায় জল জমার অবকাশ নেই। গাড়িরবাইরে ঝকঝকে সূর্যের আলো প্রখর হলেও তা হালকা শীতের সময়ের মতো মনোরম। সবমিলিয়ে এই বৃষ্টিপাতে জ্যৈষ্ঠের আসলোর সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশ শরতের মতোই মোহময় মনে হয়েছিল আমাদের।

নির্মলদার বাড়ি অসলোর বনেদি পাড়া স্টেইনপ্রাণজেট অঞ্চলে। এক শ্যামল উপত্যকার তিনতলায়। চমৎকার দু'কামরার ফ্ল্যাট। কল্পনাবৌদি আমাদের জন্য লুচি আর আলুরদমের আয়োজন করেছিলেন। নির্মলদার খাবার ঘরে বসে আলুর দম্ লুচি আর দেবাঞ্জনের কলকাতা থেকে আনা ভীমনাগের জলভরা তালশাঁস সন্দেশ খেতে খেতে আমাদের মনে হচ্ছিল অ

ামরা কলকাতাতেই বসে আছি যেন। এখানেই শেষ নয় -- আমাদের মুখবদলের জন্য কল্পনাবৌদি প্রতিদিন বিভিন্ন পদ রেঁধেছেন। আমরা সমুদ্রের নোনাজলের 'আলস' মাছ খেয়েছি যার গন্ধ আমাদের প্লেটের পুরো জায়গা জুড়ে আলো হয়ে অবস্থান করেছে। মানুষ পেট ভরে ভাত খায় মাছের ঝোল দিয়ে মেখে, আর আমরা পেট ভরে মাছ খেয়েছিলাম ভাত দিয়ে।

বিকেলে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছিলাম পায়ে হেঁটে -- একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা হল। আমরা একটা বড়ো রাস্তার ফুটপথে দাঁড়িয়েছিলাম। রাস্তা পেরিয়ে ওপারে যাবার জন্য। দেখলাম রাস্তার মোটরগাড়ি আমাদের কাছে এসে একটু পেছিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমরাও ফুটপথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি যে মোটর গাড়ি চলে গেলেই রাস্তা পেরোবো। ওদিকে মোটর চালক দাঁড়িয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে যে আমরা রাস্তা পেরোলেই তারা রওনা দেবে। গাড়ির পেছনে গাড়ি দাঁড়িয়ে লম্বা লাইন পড়ে যায় কিন্তু কোন হর্নের শব্দ নেই। শেষে লাইনের প্রথম গাড়ির চালক জানলা দিয়ে ঝুঁকে অত্যন্ত বিনীতভাবে প্রায় লক্ষ্ণৌয়ের কায়দায় 'পহলে আপ' বলে আমাদের রাস্তা পেরিয়ে যাবার কণভাবে আবেদন জানায়। আমরা যুথবদ্ধ হাতিদের মতো গজেন্দ্রগমনে রাস্তার ওপারে যেতে অচল গাড়ির মিছিল সচল হয়ে ওঠে। এর সঙ্গে আম াদের দেশের চিত্রটা একটু মিলিয়ে নিন। সকালে তণী মা তার শিশুপুত্রকে নিয়ে ভোরবেলা স্কুলেপৌঁছতে যাচ্ছিলেন। বি. টি. রোডে পুলিশ নেই লালবাতির নিষেধ উপেক্ষা করে মা - ছেলেকে চাপা দিয়ে গাড়িচালক পালিয়ে যায় অনায়াসে। পুলিশের দেখা পাওয়া যায় দু'ঘন্টা বাদে।

নরওয়েতে শতকরা একশজন মানুষই শিক্ষিত। সে দেশের সংবিধানে উল্লেখ করা না থাকলেও প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের লেখাপড়া নিঃশুল্ক এবং বাধ্যতামূলক। গোটা নরওয়ে রাষ্ট্রে লোকসংখ্যা পয়তাল্লিশ লক্ষ। তার মধ্যে রাজধানী অসলোতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলে মাত্র পাঁচলক্ষ মানুষ। অসলের রাস্তায় লোকজনদের দেখা তাই কচিৎ কদাচিৎ পেয়েছি। নরওয়েজীয়ান ভাষার সঙ্গে সুইডিশ ভাষার প্রচুর মিল আছে। কারণ ১৯০৫ সাল পর্যন্ত নরওয়ে আর সুইডেন আলাদা আলাদা রাষ্ট্র ছিল না। সেবছর সুইডেনের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নরওয়ে বেশ গরিব হয়ে পড়ে - অনেকটা আম াদের উন্নয়নশীল দেশের একজন ছিল। সেই দেশই ১৯৭৪ সালে উত্তর সাগরে নতুন তেলের ভাণ্ডার আবিষ্কার করে অ াজ পৃথিবীর ধনী দেশের মধ্যে অন্যতম। ইউরোপের অন্যসমস্ত দেশের তুলনায় এখানে সাধারণ জীবনযাত্রা সবথেকে ব্যয়বহুল। মাথা পিছু বার্ষিক আয় ষোলো হাজার ইউরোরও বেশি অর্থাৎ ভারতীয় টাকায় সাতলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। ভারতের সঙ্গে তুলনা করে আর মন খারাপ করতে চাই না।

নরওয়ের মোট জমির মাত্র তিন শতাংশ কৃষিকাজ করার যোগ্য বলে নরওয়ে তার খাদ্যশস্য অধিকাংশ আমদানি করে। প্রতিবর্গ কিলোমিটারে লোকবসতি পনেরো জন। দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যের অর্থাৎ চিজ মাখন মিল্ক পাউডার নিজের দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ব রপ্তানি করে। রপ্তানি করে মাছ এবং মাংসও। বিশাল অরণ্য অঞ্চল (দেশটির পঁচিশ শতাংশ বনভূমি) থাকায় কাঠ এবং কাগজ শিল্পে দেশটি উন্নত। নির্মলদার বাড়ির মেঝে কাঠের এবং দেওয়ালে প্রথাগত সিমেন্টের প্লাসটা রিং -এর বদলে কাঠের প্যানেলিং করা। আমাদের চৌরাঙ্গিপাড়ার কিছু সাবেক বাড়িতে আজও কাঠের সিঁড়ি দেখতে প াওয়া যায়।

নরওয়েতে আমাদের প্রথম রাত্রিবাসের অভিজ্ঞতাটি বাস্তবিকই গল্প - উপন্যাসের মতোই চমকপ্রদ। নির্মলদার দুই মেয়ে - বড়ো মেয়ে মৌ অষ্টাদশী বাস্তবিদ্যায় পড়াশোড়া করছে আর দ্বাদশী বুলবুলি ক্লাস সিক্সের ছাত্রী। রাত দশটা পর্যন্ত গৃহকর্তার সৌজন্যে নরওয়ের সুস্বাদু পানীয়ের গ্লাস হাতে মৌ আর বুলবুলির পিয়ানো বাজনা শুনতে শুনতে আড্ডার প ালা শেষ করে সাড়ে দশটায় খাবার টেবিলে বসে দেখা গেল কাচের দরজার ওপাশের প্রকৃতি তখনো বিকেলের রোদের আলোয় ঝলমলে হয়ে আছে। সে আলো আমাদের বিকেলের থেকেও প্রখর। হাতে ঘড়ি না থাকলে এবং পেট খিদের সংকেত পাঠাতে না থাকলে কেবল আকাশ দেখে কখনই আমরা রাতের ডিনার খেতে বসার কল্পনা করতে পারতাম না। ঘড়ির কাঁটার নির্দেশে রাত (?) বারোটায় যখন ঘুমোতে যাচ্ছিলাম তখন পর্দাটেনে ঘরের মধ্যে বাইরের আলোর প্রবেশ কম করতে হল। জানলাম সূর্য এসময়ে (জুন - জুলাইয়ে) অস্ত যায় রাত দেড়টায়। দেড়টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত সন্ধ্যায় গোধূলিলগ্নের মতো হালকা আলো আঁধারির পর সূর্যিমামা আবার পাটে বসেন 'গায়ে রাঙা জামা' দিয়ে।

পরের দিন সকালে কল্পনাবৌদির গাড়িতে আমরা নরওয়ের দর্শনীয় জায়গাগুলো এক এক করে দেখলাম। ব্রেকফাস্টে ছে

ালার ডাল আর পরোটার সঙ্গে কলা ও মিষ্টি পেট ভরে খেয়েছিলাম, যাতে সারাদিন চলতে পারে। তবু কল্পনাবৌদি পথে আপেল কিনলেন কুড়ি ক্রোনার কিলো হিসেবে। আমার আপেল দেখে মনে হয়েছিল ১৪০ টাকা করে কিলোতে একেবারে সবুজ আপেল কিনে ডাহা ঠক্‌ঠেন কল্পনাবৌদি কারণ ঐ কাঁচা আপেল আমরা কেউ খেতে পারবো না, ফেলে দিতে হবে। কিন্তু দুপুরে খাবার সময় ভুল ভাঙলো -- টুকটুকে কাশ্মিরী আপেলের থেকে তা অনেক বেশি রসালো এবং দ্বিগুণ মিষ্টি তো বটেই।

আমরা সেদিন গিয়েছিলাম ভিগেল্যাণ্ড পার্ক, হোলমেনকোলেনের শীতকালীন অলিম্পিক স্কেটিং রিংক, ভাইকিং মিউজিয়াম, বিগডয় সমুদ্রতট, আকেরবিগ্গের বন্দর। অসলো শহরের মধ্যাঞ্চলে ভিগেল্যাণ্ড পার্ককে স্থানীয় লোকেরা ফ্রগনার গার্ডেনও বলে থাকে। ভাস্কর্য শিল্পী গুস্তাভ ভিগেল্যান্ড (১৮৬৯ - ১৯৪৩) তাঁর সারাজীবনের ভাস্কর্য শিল্প দিয়ে সাজিয়েছিলেন পার্কটি। সমস্ত পার্কটির বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য পাথর আর ব্রোঞ্জের শিল্পকলা -- সবই পুষ ও প্রকৃতির অর্থাৎ নর - নারীদের প্রামাণ্য প্রতিকৃতি। সব বয়সের নারী পুষ রয়েছে -- একেবারে শিশু থেকে নিয়ে বয়ঃক্রমের প্রতিটি পর্ব, কিশোর, উদ্ভিন্ন তণ - তণী, মধ্যাহ্নের যৌবনদীপ্ত প্রৌঢ়া এবং নতস্তন বিগতযৌবন বৃদ্ধ - বৃদ্ধা। কিন্তু সকলেই আবরণহীন নগ্ন - নগ্নিকা। একটু অন্যমনস্ক হলেই আপনার মনেহতে পারে আপনার চারপাশে বেশ কিছু নাটকের চরিত্র যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে যাদের নির্দেশক জন্মের পোশাকে অভিনয় করতে বলেছেন বা তারা নিজেরাই সেভাবে থাকতে ভালোবাসে হয়তো। নরওয়েবাসীদের এবিষয়ে কোন চিত্তবিকার নেই-- তারা এটাকে জীবনচক্রের একটা স্বাভাবিক অঙ্গ হিসেবে মনে করে। বিগডয় সমুদ্রতটেও দেখা গেল স্বল্পবসনা নরনারীরা সেদেশে দুর্লভ সূর্যকিরণ শরীরে মেখেনিচ্ছেন। কল্পনাবৌদি বল্লেন কাছেই একটি আর একটু নিভৃত সমুদ্রতট আছে যেখানে সূর্যালোকপিয়াসী মানব - মানবীরা সম্পূর্ণ নিরাবরণ বিচরণ করে থাকে। আমরা অবশ্য আমাদের নাগরিক সভ্যতায় সজ্জিত পোশাক নিয়ে তাদের শালীনতা ভঙ্গ করতে যাইনি। এই ধরনের ন্যুড - চর্চা (বা ন্যুড ক্লাব) ইউরোপের সর্বত্রই রয়েছে। ডারউইনের বিবর্তনের সূত্র পেছনে ফেলে মানবিক সভ্যতা হয়ত আবার প্রকৃতির কাছাকাছি ফিরে যেতে চাইছে।

নরওয়ের লেখকসংস্থা 'নরস্ক ফরফ্যাটার সেন্ট্রাম' - এর সভাপতি টম লোথারিংটনের সঙ্গে আমাদের বৈঠক ছিল ১১ জুন ২০০৪। আমাদের সঙ্গে আলোচনার আগে টমের বিশেষ কোনো স্বচ্ছ ধারণা ছিল না ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে -- যদিও আমরা তিনজন নরওয়েয়িান সাহিত্যিকের নোবেল পদক জয়ের সংবাদ জানতাম। কিন্তু টম ভারতীয় কোনো সাহিত্যিক নোবল প্রাইজ পেয়েছেনে বলে জানতেন না। তিনি রবীন্দ্রনাথের নাম শোনেননি। টম আমাতর তাঁর সংস্থার একটি ক্যাটালগ দিলেন প্রত্যেককে আলাদা আলাদাভাবে স্বাক্ষর করে। এই ক্যাটালগে নরওয়ের জীবিত সকল লেখক সদস্যের নাম ও প্রকাশিত বইয়েৰ বিস্তৃত তালিকা দেওয়া আছে। তার থেকে জানলাম টমের জন্ম ১৯৫০ সালে এবং বাইশ বছর বয়সে ১৯৭২ সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং ১৯৯৮ খ্রিঃ পর্যন্ত তাঁর ১০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। টমের কাছে জানলাম সরকারের সংস্কৃতি বিভাগ লেখকসংস্থাকে ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে সহযোগিতাকরেন নানান অনুদানের মাধ্যমে। সাক্ষাৎকারের শেষে নির্মলদার সঙ্গে অসলোর অফিস পাড়ায় ভিখ্যাত পাব - এ, যেখানে স্থানীয় সাহিত্যিকেরা আড্ডা দেয়, সেখানে টেবিল বিয়ারের বোতল আর পিজা নিয়ে আমরাও জমিয়ে আড্ডা দিয়েছি। আমাদের আগমনের সংবাদে স্থানীয় কবি ও সাংসদ সুরেশ শুক্লা (ভারতীয় বংশোদ্ভুত) আমাদের নরওয়ের বেশ কিছু দ্রষ্টব্য স্থান ঘুরিয়ে দেখিয়ে ছিলেন এবং বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজে আপ্যায়ন করেন। শুক্লাজীর কবিতা ভারতের উল্লেখযোগ্য হিন্দি পত্রপত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

অসলোর সম্ভ্রান্ত কেন্দ্রীয় পাঠাগারে (ডাইকমানস্কে বিবলিওটেক) বড়ো হল ঘরটিতে আমাদের কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান শুরু হল ১২ জুন দুপুর বারোটায়। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ পাকিস্তান, নরওয়েজিয়ান ভাষার কবি ও নরওয়েবাসী বাঙালি কবিদের নিয়ে সত্যিই তা এক বিশেষ আন্তর্জাতিক সাহিত্য সেমিনার বলা যেতে পারে। কবিতা - পাঠের আগে আমাদের চারজনকে সুদৃশ্য স্মারক (নরওয়ের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির চিত্র - আঁকা বোন - চায়নার সুদৃশ্য প্লেট) ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয়। ফুল নরওয়েতে দুর্লভ নয় কিন্তু অত্যন্ত মহার্ঘ জিনিস। গ্লাডিওলা ও গোলাপ দিয়ে সোনালি রাংতায় মোড়া স্তবকের, পরে জেনেছিলাম, এক একটির দাম ছিল পঁচানববই ক্রোনার, মানে ছ'শো পয়ষট্টি টাকা। নরওয়েজিয়ান কবিদের মধ্যে ছিলেন লার্স আমন্দভাগে, অ্যানে এলিজাবেথ ব্রামনেস, টম লোথারিংটন, আরলিং ইনড্রেইড ও আর্নে স্তি।

স্থানীয় কবিদের মধ্যে বাংলাভাষী ছিলেন নির্মল ব্রহ্মচারী, ইন্দ্রজিৎ পাল, হিন্দিতেসুরেশ শুক্লা, উর্দুতে অবতার সিং ধিন্দসা আর আবৃত্তিতে (অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের কবিতায়) ডঃ অসীম দত্তরায়। পাকিস্তান থেকে এসেছিলেন জামশেদ মাসুর, খালিদ হোসেন ও ফৈসল হাসমি।

অন্যরা তাদের মাতৃভাষায় কবিতা পাঠ করলেও আমরা আমাদের কবিতা প্রথমে মূল বাংলায় ও পরে তার ইঁরেজি অনুবাদ পড়ি। আমাদের প্রত্যেকের কবিতার নরওয়েজিয়ান ভাষায় অনুবাদ ও জীবনী পড়ে শোনান নির্মলদা। আসর শেষ হবার সামান্য কিছু আগে আফগানিস্তান ও ইরানের দুই কবি এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরাও স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন। এই সমবেত সাহিত্যচর্চার মধ্যে সেদিন তিন ঘন্টা সময় এক অনাবিল ও স্মরণীয় আনন্দ - আবেগের মধ্যে কেটে যায়। সামগ্র অনুষ্ঠানটি অসাধারণ দক্ষতায় পরিচালনা করেন নরওয়ের এক তীব্র সুন্দরী তণী অ্যানা নায়েগ্লেন। আমাদের থেকে মাথায় অন্তত দেড়ফুট বেশি দীর্ঘাঙ্গী এই সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী তণী নিজেও সাহিত্যমনস্কা ও কবি। আমার স্থির বিশ্বাস সেই বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় নামলে অনায়াসে শ্রেষ্ঠ সুন্দরীর মুকুটটা মাথায়তুলে নিতে পারবে। তার উচ্চারণে আমাদের বাংলা বর্ণাক্ষরের নামগুলি শুনে সেদিন যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করেছিলাম।

হিন্দি, উর্দু ও বাংলা ছাড়া অন্যভাষায় যাঁরা কবিতা পড়লেন, তাঁদের কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবটির রসাস্বাদন হয়ত আমরা করতে পারিনি, যেহেতু, ইংরেজি বা বাংলাতে অনুবাদের ব্যবস্থা কোন একটি তন্ত্রীতে যে বাঙময় প্রতিধ্বনি তুলেছিল তাতেই আমরা মোহিত হয়েছিলাম। তাই ভাষার বেড়াজালে আটকে থেকেও সংগীতের সুরের মূর্ছনা উপভোগের মতোই সেদিন বিদেশি সকল কবিদের কবিতায় নিবিষ্ট হতে আমাদের তেমন কোন অসুবিধা হয়নি। ভারতের প্রাদেশিক ভাষায় কবিতাপাঠের আসরে উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা ছিল এতদিন, কিন্তু এই আন্তর্জাতিক কাব্যালোচনার অভিমুখিতা (এক্সপোজার) নিঃসন্দেহে আমার কাছে এক বড়ো সম্পদ হয়ে থাকবে। আমাদের মধ্যে আশিসদার (কবি আশিস সান্যাল) অবশ্য এর আগেও অন্য আন্তর্জাতিক কবিতাপাঠের আসরে উপস্থিত থাকার অভিজ্ঞতা ছিল।

দর্শক ও কবিদের সকলের জন্য অনুষ্ঠানের পর ভুরিভোজনের ব্যবস্থা ছিল। এটাই নাকি এখানকার অলিখিত রীতির -- অনেকটা যেন, আমি আমার মূল্যবান তিনঘন্টা সময় অকাতরে তোমাদের কবিতা শোনার অনুষ্ঠানে ব্যয় করলাম তার জন্য বিনিময়ে এই ভোজনের দাবি করতেই পারি। পরে দেখেছি সুইডেনে কবি রঞ্জিত চৌধুরীর বাড়ির ঘরোয়া অনুষ্ঠান এবং ফ্রান্সে ইণ্ডিয়া হাউসের জমজমাট আনুষ্ঠানিক কবিতা পাঠের শেষে কবি, ও শ্রোতা প্রায় সকলের জন্য উৎসবের মতো ভোজের আয়োজন ছিল।

আমাদের এখানে জীবনানন্দ সভাঘরে কবিতা পাঠের সময়ে শ্রোতাদের অভাবে হলের বেশিরভাগ খালি চেয়ার মঞ্চে উপবিষ্ট কবিকে যখন বিদ্রূপ করে বা কবিতা পাঠ চলাকালীন শ্রোতারা একে একে উঠে যেতে থাকে তখন মনখারাপ হয়ে যায়। কবিতাপাঠেরশেষপর্বে ভোজনের আয়োজন এখানেও চালু করলে শ্রোতাদের হয়ত সপরিবার উপস্থিতি নিশ্চিত করা যেত। সংগঠকরা ভেবে দেখতে পারেন বিষয়টা।

অনুষ্ঠানের শেষে আপাতগর্বিত ও আপ্লুত সভাপতি নির্মল ব্রহ্মচারী ঘোষণা করেছিলেন যে নরওয়েতে এমন আন্তর্জাতিক ঘরানার আনুষ্ঠানিক বাংলা কবিতাপাঠের আসর এর আগে কখনও হয়নি।

এই স্মৃতি রোমন্থন করতে বসে একটা কথাই আজ বারবার মনে হচ্ছে -- সাহিত্যের মাধ্যমে শুধু নিজের অনুভবের দুয়ারই খোলা যায় না, বিশ্বের অনেক বন্ধ দরজাও অবারিত হয়ে সাদর আমন্ত্রণের হাত বাড়িয়ে দেয়। অন্তত তার সুযোগ আসে। কবিতার কাছে আমি তাই আমৃত্যু আমার নতজানু ঋণ স্বীকারের কথা এখানে নথিবদ্ধ করে যেতে চাই আমরা দু' লাইনের একটি কবিতায়

কবিতা আমার নিঃস্ব যাপনে
অশেষ অমল পরশপাথর।'

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com